بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ ডিসেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ০৪ ফাতাহ্, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবা থেকে হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছে। আজও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে। হযরত আলী (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সম্পর্কে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত আলীকে দু'বার নিজের ভাই আখ্যায়িত করেছেন। একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাজেরদের মাঝে মক্কায় ভাই পেতে দেন। এরপর তিনি মুহাজের এবং আনসারদের মাঝে মদিনায় হিজরতের পর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। দু'বারই হযরত আলীকে বলেন, 'আনতা আখী ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরা' অর্থাৎ তুমি ইহজগত ও পরকালে আমার ভাই। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) এবং হযরত সাহাল বিন হুনায়েফ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন কোন্ কোন্ সময় হয়েছে– সে সম্পর্কে ইতিহাসে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো, ভ্রাতৃত্ব দু'বার স্থাপিত হয়েছে। যেমন সহীহ্ বুখারীর একজন ব্যাখ্যাতা আল্লামা কসতলানি বর্ণনা করেন যে, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দু'বার স্থাপিত হয়েছে। প্রথমবার হিজরতের পূর্বে মক্কায় মুহাজেরদের মাঝে, যখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের মাঝে, হযরত উসমান ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এর মাঝে, হযরত যুবায়ের ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-এর মাঝে আর হযরত আলী ও নিজের মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। এরপর তিনি (সা.) যখন মদিনায় আসেন, তখন মুহাজের ও আনসারদের মাঝে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর ঘরে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা.) একশ সাহাবীর অর্থাৎ পঞ্চাশজন মুহাজের ও পঞ্চাশজন আনসারের মাঝে মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত আলী বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন; কেবল তাবুকের যুদ্ধ ব্যতিরেকে। তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (সা.) তাকে স্বীয় পরিবার-পরিজনের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

হযরত সালেবা বিন আবু মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) সকল উপলক্ষ্যে মহানবী (সা.)-এর পতাকা বহন করতেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের সময় হতো তখন হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) পতাকা নিয়ে নিতেন।

উশায়রা-র যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সমূহে এ যুদ্ধের নাম উশায়রা, যুল উশায়রা, যাতুল উশায়রা এবং উসায়রা'র যুদ্ধও বর্ণিত হয়েছে। উশায়রা একটি দুর্গের নাম, যা হেজায-এর ইয়াম্বু এবং যুল মারওয়া এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে,

দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে মক্কার কুরাইশদের সম্পর্কে কোন সংবাদের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) মুহাজেরদের একটি দলসহ মদিনা থেকে বের হন এবং নিজের অবর্তমানে তাঁর দুধভাই আবু সালমাহ্ বিন আব্দুল আসাদকে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেন। এই যুদ্ধে তিনি (সা.) চক্রাকারে কয়েকবার ঘুরে অবশেষে সমুদ্র তীরবর্তী স্থান ইয়াম্বু-র

পার্শ্ববর্তী (এলাকা) উশায়রায় পৌঁছেন। যদিও কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ হয় নি কিন্তু এই সময় তিনি (সা.) বনু মুদলেজ গোত্রের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ফিরে আসেন।

হযরত আলী (রা.) এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। এ সম্পর্কে মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এর রেওয়ায়েত হলো, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) বর্ণনা করেন যে, غزوة ذات العشيرة। যাতুল উশায়রা-র যুদ্ধে হযরত আলী এবং আমি সফর-সঙ্গী ছিলাম। মহানবী (সা.) যখন সেই স্থানে পৌঁছেন এবং সেখানে যাত্রা বিরতি দেন তখন আমরা বনু মুদলেজ গোত্রের লোকদেরকে খেজুর-বাগানে নিজেদের একটি ঝরনার পাশে কর্মরত দেখতে পাই। হযরত আলী (রা.) আমাকে বলেন, হে আবু ইয়াকযান! তুমি কী বল– আমরা কি তাদের কাছে গিয়ে দেখব যে, তারা কি করছে? অতএব আমরা তাদের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করি, এরপর আমাদের ঘুম পেলে আমি এবং হযরত আলী (রা.) সেখান থেকে বেরিয়ে খেজুরের বাগানে মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়ি। আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.) ছাড়া আর কেউ আমাদেরকে জাগায় নি। তিনি (সা.) তাঁর পায়ের স্পর্শে আমাদেরকে জাগ্রত করেন, তখন আমাদের দেহ ধূলিমলিন ছিল। সেদিন মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর দেহে মাটি দেখে বলেছিলেন, হে আবু তুরাব! (অর্থাৎ, হে মাটির পিতা) আমি কি তোমাকে দু'জন চরম পাপিষ্ঠ সম্পর্কে বলব না? আবু তুরাবের কথা গত খুতবাতেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, (হযরত আলী) মসজিদে শায়িত ছিলেন, তার শরীরে মাটি লেগেছিল দেখে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, হে আবু তুরাব! অর্থাৎ আবু তুরাব নামে ডেকেছিলেন আর তখন থেকে এটি তার ডাক নাম পড়ে যায়। অথবা হতে পারে, তখন তিনি (সা.) তার এই ডাক নাম রাখেন বা পরবর্তীতে এই নামে সম্বোধন করে থাকবেন অথবা দু'স্থানেই বলে থাকবেন। মনে হয় এই নাম পূর্বেই রেখেছিলেন। যাহোক তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে দু'জন চরম দুর্ভাগা সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)। তিনি (সা.) বলেন, প্রথমজন হলো, সামূদ জাতির উহায়মার; যে হযরত সালেহ্ (আ.)-এর উষ্ট্রীর পা কেটে দিয়েছিল। আর দ্বিতীয়জন হলো, হে আলী সে, যে! তোমার মাথায় আঘাত করবে; ফলে তোমার দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে।

সাফওয়ানের যুদ্ধ, বদরুল উলা, দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল আখের মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এভাবে লিখেছেন যে, উশায়রা-র যুদ্ধ শেষ হওয়া ও মহানবী (সা.)-এর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের দশ দিন অতিবাহিত না হতেই মক্কার এক নেতা কুরয্ বিন জাবের ফেহরী কুরাইশদের একটি সৈন্যদলের সাথে চরম ধূর্ততার সাথে শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত মদিনার চারণভূমিতে অতর্কিতে হামলা করে আর মুসলমানদের উট ইত্যাদি লুটপাট করে নিয়ে যায়। মহানবী (সা.) এই সংবাদ পাওয়া মাত্র যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে তাঁর (সা.) অবর্তমানে আমীর নিযুক্ত করে মুহাজেরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন আর বদরের নিকটবর্তী একটি জায়গা সাফওয়ান পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধকে বদরুল উলা'র যুদ্ধও বলা হয়। এই যুদ্ধে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সাদা পতাকা দিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধ হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরী মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, এতে হযরত আলী (রা.)-এর ভূমিকা সম্পর্কে যা জানা যায়, মহানবী (সা.) হযরত আলী, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত বাসবাস বিন আমর (রা.)-কে মুশরেকদের খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বদরের ঝরনার (কাছে) প্রেরণ করেন। তারা কুরাইশদেরকে তাদের গবাদিপশুকে পানি পান করাতে দেখেন আর তারা মুশরেকদের সেই দলটিকে ধরে মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থাপন করেন। বদরের যুদ্ধের সময় যখন উভয় সেনাদল মুখোমুখি হয় তখন সর্বপ্রথম রবীআ'-র দুই

পুত্র শায়বা, উতবা এবং ওয়ালীদ বিন উতবা এগিয়ে আসে এবং সম্মুখ সমরের আহ্বান জানায়। তখন বনু হারেস গোত্রের তিনজন আনসারী অর্থাৎ আফরা-র পুত্র মুআ'য, মুয়াওয়েয এবং অওফ, তাদের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যান; কিন্তু মহানবী (সা.) এটি অপছন্দ করেন যে, মুসলমান ও মুশরেকদের মধ্যকার প্রথম যুদ্ধে আনসাররা যোগ দিবে, বরং তিনি চাচ্ছিলেন, তাঁর চাচার সন্তান এবং তাঁর স্বজাতির মাধ্যমে এই মহিমা প্রকাশিত হোক। তাঁর (সা.) নির্দেশে আনসারগণ সারিতে ফিরে আসেন এবং তিনি (সা.) তাদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন। এরপর মুশরেকরা বলে, হে মুহাম্মদ! আমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের জাতির লোকদের মধ্যে থেকে আমাদের সমপর্যায়ের লোক প্রেরণ কর। অতএব মহানবী (সা.) বলেন, হে বনু হাশেম! যখন তারা মিথ্যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করার জন্য এসেছে সেক্ষেত্রে তোমরা দণ্ডায়মান হও, তোমাদের অধিকারের জন্য যুদ্ধ কর, যার সাথে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের নবীকে প্রেরণ করেছেন। অতএব হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, হযরত আলী বিন আবু তালেব এবং হযরত উবায়দা বিন হারেস দণ্ডায়মান হন এবং তাদের দিকে অগ্রসর হন। তখন উতবা বলে, কথা বল যেন আমরা তোমাদেরকে চিনতে পারি। তারা শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন, যে কারণে তাদের চেহারা ঢাকা ছিল। হযরত হামযা বলেন, আমি হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সিংহ। এতে উতবা বলে, ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী আর আমি মিত্রদের সিংহ, তোমার সাথে এই দুজন কে? হযরত হামযা বলেন, আলী বিন আবু তালেব এবং উবায়দা বিন হারেস। উতবা বলে, উভয়েই ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী। উতবা তার ছেলেকে বলে, হে ওয়ালীদ ওঠ। অতএব হযরত আলী তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে আসেন আর তাদের উভয়ের মাঝে তরবারির যুদ্ধ হয় এবং হযরত আলী তাকে হত্যা করেন। এরপর উতবা দণ্ডায়মান হয় এবং তার বিপরীতে হযরত হামযা এগিয়ে আসেন। তাদের উভয়ের মাঝে তরবারির যুদ্ধ হয় এবং হযরত হামযা তাকে হত্যা করেন। তারপর শায়বা দণ্ডায়মান হয় এবং তার মোকাবিলায় হযরত উবায়দা বিন হারেস এগিয়ে আসেন। হযরত উবায়দা সেদিন মহানবী (সা.) এর সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি বয়স্ক ছিলেন। শায়বা হযরত উবায়দার পায়ে তরবারির প্রান্ত দিয়ে আঘাত করে যা তার পায়ের গোছায় লাগে এবং তা কেটে যায়। হযরত হামযা এবং হযরত আলী শায়বার ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করেন। এই রেওয়ায়েতটি দুই বছর পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিছু অংশ আমি (পুনরায়) উল্লেখ করছি। অপর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যাতে এর উল্লেখ এভাবে হয়েছে যে, হযরত আলী বর্ণনা করেন, উতবা বিন রাবিআ এবং তার সাথে তার পুত্র এবং ভাইও বের হয় এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে, আমাদের মোকাবিলায় কে অগ্রসর হবে? তখন আনসারদের বেশ কয়েকজন যুবক এর উত্তর দেয়। উতবা জিজ্ঞেস করে; তোমরা কারা? তারা বলে, আমরা আনসার। উতবা বলে, তোমাদের সাথে আমাদের কোন কাজ নেই, আমরা কেবল আমাদের চাচাতো ভাইদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে হামযা উঠ, হে আলী দণ্ডায়মান হও, হে উবায়দা বিন হারেস অগ্রসর হও। হযরত হামযা উতবার দিকে অগ্রসর হন এবং হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি শায়বার দিকে অগ্রসর হই আর উবায়দা এবং ওয়ালীদের মাঝে লড়াই হয় আর তারা একে অপরকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এরপর আমরা ওয়ালীদকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করি আর হযরত উবায়দা-কে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি। হযরত আলী (রা.) বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, এই যুদ্ধে মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। মহানবী (সা.) সারারাত খোদা তা'লার দরবারে বিনয়াবনত দোয়া ও আহাজারি করতে থাকেন। কাফের বাহিনী যখন আমাদের নিকটবর্তী হয় আর আমরা তাদের সম্মুখে সারিতে অবস্থান নেই তখন হঠাৎ এক ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি পড়ে, যে লাল উটে আরোহিত ছিল আর মানুষের মাঝে তার বাহন হাঁটছিল।

মহানবী (সা.) বলেন, হে আলী! কাফেরদের নিকট দণ্ডায়মান হামযাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর যে, লাল উটে আরোহিত ব্যক্তিটি কে আর সে কি বলছে? অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, তাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি তাদেরকে কল্যাণের কথা বলতে পারে তাহলে সে হচ্ছে সেই লাল উটে আরোহিত ব্যক্তি। ইতোমধ্যে হযরত হামযা (রা.)ও চলে আসেন। তিনি এসে বলেন যে, সেই ব্যক্তি হচ্ছে উতবা বিন রবীআ, যে কাফেরদের যুদ্ধ করতে বারণ করছে। তার কথার উত্তরে আবু জাহল তাকে বলে যে, তুমি একজন ভীতু আর যুদ্ধকে ভয় পাও। উতবা উত্তেজিত হয়ে বলে, আজ দেখা যাবে কে ভীতু? যাহোক এরপর সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের সময় আমার ও আবু বকর সম্পর্কে বলেন, তোমাদের উভয়ের মাঝে একজনের ডান পাশে হযরত জিবরাইল আছেন এবং অপরজনের ডান পাশে মিকাইল আছেন আর মহান এক ফিরিশতা হলেন হযরত ইস্রাফিল, যিনি যুদ্ধের সময় এসে উপস্থিত হন এবং সারিতে দণ্ডায়মান হন। হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব বদরের যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন, হযরত আলী বলেন, যুদ্ধরত অবস্থায় মহানবী (সা.) এর কথা আমার মনে পড়তো আর আমি তাঁর তাবুর দিকে ছুটে যেতাম কিন্তু যখনই আমি তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁকে সিজদায় আকুতিমিনতি রত পেয়েছি। আমি নিজ কানে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, "হে চীরস্থায়ী-চীরঞ্জীব খোদা, হে আমার খোদা! হে আমার জীবিত খোদা! হে আমার খোদা, জীবনদ্বাতা খোদা!" হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়তেন আর কখনো কখনো অকৃত্রিম ভালবাসায় বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল আমার মা-বাবা আপনার জন্য নিবেদিত। আপনি ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ্ অবশ্যই নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। তাসত্ত্বেও মহানবী (সা.) লাগাতার দোয়ায় লেগে থাকেন আর শঙ্কিত ছিলেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কখনো কখনো শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে।

হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে হযরত আলীর বিয়ে হয় দ্বিতীয় হিজরী সনে। হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে হযরত ফাতেমার জন্য বিবাহ করার প্রস্তাব দেন এবং মহানবী (সা.) স্বানন্দে সম্মত হন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একে একে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর উভয়েই মহানবী (সা.)-এর কাছে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন কিন্তু মহানবী (সা.) নিশ্চুপ ছিলেন এবং তাদের কোন উত্তর দেন নি। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে হযরত ফাতেমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেই। তিনি (সা.) বলেন, তোমার কাছে মোহরানার জন্য কিছু আছে কী? আমি নিবেদন করি যে, আমার ঘোড়া এবং আমার বর্ম আছে। তিনি (সা.) বলেন, ঘোড়া তোমার নিজের কাছে থাকা আবশ্যক তবে তোমার বর্ম বিক্রি করে দাও। অতএব আমি আমার বর্ম চারশত আশি দিরহামমূল্যে বিক্রি করে মোহরানার ব্যবস্থা করলাম। মানুষ বলে, দেনমোহর যা পার নির্ধারণ করে নাও ,পরিশোধের কথা পরে দেখা যাবে। মহানবী (সা.) বলেন, প্রথমে দেনমোহরের ব্যবস্থা করো। এর অর্থ হলো, মোহরানা নারীর তাৎক্ষনিক প্রাপ্য। কেউকেউ আমাকে লিখে দেয় যে, মহিলারা আমাদের কাছে দেনমোহর দাবি করছে অথচ আমরা তো সুখেই আছি। যদি তারা চায় তাহলে তাদের অধিকার হিসেবে তারা চায়, চাওয়া মাত্র তা পরিশোধযোগ্য। পরে এটি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়ে যায় অথবা তালাক বা খোলার সময় এ বিষয়টি সামনে আসে, অথচ তালাক বা খোলার সাথে দেন-মোহরের কোন সম্পর্কই নেই।

যাহোক, অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে হযরত আলী (রা.) বর্ম বিক্রি করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) বর্মের যথার্থ মূল্য পরিশোধ করেন এবং বর্মও ফেরত দেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি সেই অর্থ নিয়ে আসি এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে তুলে দেই। তিনি (সা.) তা থেকে এক মুষ্টিপরিমান হযরত বেলালের হাতে

দিয়ে বলেন, এগুলো দিয়ে কিছু সুগন্ধি ক্রয় করে নিয়ে আসো আর কয়েকজনকে অদেশ দিলেন যে, হযরত ফাতেমার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আয়োজন করো। অতএব হযরত ফাতেমার জন্য একটি খাট, চামড়ার একটি বালিশ প্রস্তুত করা হয় যা খেজুর গাছের ছাল-বাকল দিয়ে ভর্তি করা হয়। এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক করার সময় তিনি (সা.) বলেন, আমার প্রভু আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কন্যা-বিদায়ের পর মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)কে বলেন, ফাতেমা তোমার গৃহে প্রবেশ করার পর আমি আসার আগ পর্যন্ত তুমি কোন কথা বলবে না। অতএব হযরত ফাতেমা (রা.) হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-এর সাথে এসে ঘরের এক অংশে বসে পড়লেন; আর আমিও এক দিকে বসে পড়লাম। অতঃপর মহানবী (সা.) আসলেন এবং বললেন, এখানে আমার ভাই আছে কি? উম্মে আয়মান (রা.) বললেন, আপনার ভাই, যার কাছে আপনি আপনার মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন? তিনি (সা.) বললেন, হাঁ। তিনি (সা.) ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং হযরত ফাতেমা (রা.) কে বললেন, আমার কাছে পানি নিয়ে আসো। (এমন আত্মীয়দের মাঝে বিবাহ হতে পারে কারণ তিনি সহোদর ভাই নন।) তিনি উঠে ঘরে রাখা পাত্রে পানি আনলেন। তিনি (সা.) পানির পাত্রটি নিলেন এবং তাতে কুলি করলেন; অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.)কে বললেন, এগিয়ে আস তিনি এগিয়ে আসেন। তিনি (সা.) তার ওপর এবং তার মাথার ওপর কিছু পানি ছিঁটালেন। তারপর দোয়া করলেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি উয়িযুহা বিকা ওয়া যুররিয়্যাতাহা মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তাকে এবং তার সন্তান-সন্ততিকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়াও। যখন তিনি ঘুরলেন তখন তিনি (সা.) তার কাঁধের মাঝখানে পানি ছিটালেন; হযরত আলী (রা.)-এর ক্ষেত্রেও এমনটিই করলেন। হযরত আলী (রা.)কে বললেন, আল্লাহ তা'লার নামে ও তাঁর আশিষ ধন্য হয়ে তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। অনুরুপভাবে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা.) একটি পাত্রে ওযু করেন অতঃপর সেই পানি হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রা.) ওপর ছিঁটিয়ে দেন; এবং দোয়া করেন, 'আল্লাহুম্মা বারিক ফিহিমা ওয়া বারিক লাহুমা ফি শামলেহিমা' অর্থাৎ হে আল্লাহ! এদের উভয়কে আশিষমণ্ডিত কর এবং এদের উভয়ের মিলনকেও মধুময় কর।

হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) আমাদেরকে হযরত ফাতেমাকে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে বা সাজানোর নির্দেশ দেন। সুতরাং আমরা বাড়ির প্রতি মনোযোগ দিলাম। আমরা বাতহা'র (মক্কার একটি উপত্যকা) নরম মাটি দিয়ে ঘর লেপলাম। এরপর খেজুরের আঁশ দিয়ে দুটি বালিশ বানালাম। আমরা নিজ হাতে তা ধুনেছিলাম। আমরা খাওয়ার জন্য খেজুর ও কিশমিশ এবং পানীয়জল রাখলাম। এবং ঘরের এক কোণে একটি কাঠ রাখলাম যেন তাতে কাপড় ও মশক ইত্যাদি ঝুলানো সম্ভব হয়। আমরা হযরত ফাতেমা (রা.) এর বিয়ের চেয়ে উত্তম কোন বিয়ে দেখি নি। খেজুর, জব, পনির এবং হ্যায়স ছিল ওলীমার খাদ্য। হ্যায়স সে খাবারকে বলে যা খেজুর এবং ঘি আর পনির ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়।

হযরত আসমা বিনতে উমায়েস বর্ণনা করেন, সে যুগে এই ওলীমার দাওয়াতের চেয়ে উত্তম কোন ওলীমা হয় নি। হযরত ফাতেমা (রা.) এবং হযরত আলীর (রা.) বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ সীরাতে খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এভাবে দেয়া হয়েছে, হযরত ফাতেমা (রা.) হযরত খাদিজার (রা.) গর্ভে জন্ম নেয়া মহানবী (সা.) এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তিনি (সা.) নিজ সন্তানদের মধ্য থেকে হযরত ফাতেমাকে (রা.) সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে তিনিই (রা.) সেই বিশেষ ভালবাসার সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন। তখন তার (রা.) বয়স ছিল প্রায় পনেরো এবং বিয়ের প্রস্তাব আসা আরম্ভ হয়ে যায়। সর্বপ্রথম হযরত

ফাতেমার (রা.) জন্য হযরত আবু বকর (রা.) আবেদন করলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) অপারগতা প্রকাশ করলেন। এরপর হযরত উমর (রা.) নিবেদন করলেন, কিন্তু তার আবেদনও গ্রহণ করলেন না। এরপর এই দুই পুণ্যাত্মা মহানবী (সা.) এর ইচ্ছা হযরত আলীর অনুকূলে ভেবে হযরত আলীকে (রা.) আহ্বান জানান যে, তুমি ফাতেমার সাথে বিয়ের প্রস্তাব দাও। হযরত আলী (রা.) যিনি সম্ভবত পূর্ব থেকেই ইচ্ছা পোষণ করতেন কিন্তু লজ্জায় নিরব ছিলেন; তৎক্ষণাত মহানবী (সা.) এর সকাসে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন। অপরদিকে মহানবী (সা.) এর প্রতি ঐশী ওহীর মাধ্যমে এ ইশারা হয়ে গিয়েছিল যে, হযরত ফাতেমার (রা.) বিয়ে হযরত আলীর (রা.) সাথেই হওয়া উচিত। সুতরাং হযরত আলী (রা.) বিয়ের প্রস্তাব দেন আর মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি তো এ বিষয়ে পূর্বেই ঐশী ইঙ্গিত পেয়েছি।' এরপর তিনি (সা.) হযরত ফাতেমার মতামত জানতে চাইলে তিনি (রা.) লজ্জার কারণে মৌনতা অবলম্বন করেন; এটিও এক প্রকার সম্মতির লক্ষ্মণ ছিল। সুতরাং মহানবী (সা.) একদল মুহাজির ও আনসারকে সমবেত করে হযরত আলী ও ফাতেমার বিয়ে পড়ান; এটি ২য় হিজরির প্রথম দিকের বা মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। বদরের যুদ্ধের পর খুব সম্ভব ২য় হিজরির যুলহাজ্জ মাসে হযরত ফাতেমাকে তুলে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। মহানবী (সা.) হযরত আলীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কাছে মোহরানায় দেয়ার মত কিছু আছে কি?' [আমি ঠিকই বলেছিলাম; ঐ বাগান-সংক্রান্ত ঘটনাটি, যা আগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা বিয়ের পূর্বেকার ঘটনা।] "মহানবী (সা.) হযরত আলীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কাছে মোহরানায় দেয়ার মত কিছু আছে কি?' হযরত আলী নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার কাছে তো কিছুই নেই!' তিনি (সা.) বলেন, 'সে বর্মটা কী করেছ যা আমি তোমাকে সেদিন (অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে) দিয়েছিলাম?' হযরত আলী নিবেদন করেন, 'সেটা তো আছে?' তিনি (সা.) বলেন, 'ঠিক আছে, সেটাই নিয়ে আস।' সুতরাং সেই বর্মটি চারশ' আশি দিরহাম মূল্যে বিক্রি করা হয় আর মহানবী (সা.) সেই অর্থ থেকে বিয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ করেন। বিয়েতে মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমাকে যেসব উপহারসামগ্রী দেন তার মধ্যে ছিল একটি নকশা করা চাদর, একটি চামড়ার গদি যা শুকনো খেজুরপাতা দিয়ে ভরা হয়েছিল, আর একটি মশ্‌ক্; অপর একটি রেওয়াতে রয়েছে যে, তিনি (সা.) হযরত ফাতেমাকে উপহারসামগ্রী হিসেবে একটি যাঁতা বা চাক্কিও দিয়েছিলেন। যখন এসব সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন ঘরের প্রশ্ন আসে। হযরত আলী এতদিন পর্যন্ত খুব সম্ভব মহানবী (সা.)-এর সাথে মসজিদ-সংলগ্ন কোন কামরায় থাকতেন, কিন্তু বিয়ের পর কোন পৃথক ঘরের প্রয়োজন ছিল যেখানে স্বামী-স্ত্রী থাকতে পারেন। তাই মহানবী (সা.) হযরত আলীকে নির্দেশ দেন, 'এখন তুমি কোন ঘর খোঁজ করো যেখানে তোমরা দু'জন থাকতে পার।' হযরত আলী সাময়িকভাবে একটি ঘরের ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে হযরত ফাতেমাকে তুলে দেয়া হয়। সেদিনই রুখসাতানার পর মহানবী (সা.) তাদের ঘরে যান এবং কিছুটা পানি আনিয়ে তাতে দোয়া পড়েন এবং সেই পানি হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী– উভয়ের ওপরেই এই দোয়া পড়ে ছিটিয়ে দেন যে, 'আল্লাহুম্মা বারিক ফীহিমা ওয়া বারিক আলাইহিমা ওয়া বারিক লাহুমা নাসলাহুমা' অর্থাৎ 'হে আমার আল্লাহ্, তুমি তাদের দু'জনের পারস্পরিক সম্পর্কে কল্যাণ দান কর, আর তাদের সেই সম্পর্কগুলো কল্যাণমণ্ডিত কর যা অন্যদের সাথে স্থাপিত হয়, আর তাদের বংশধরদের আশিষমণ্ডিত কর।' অতঃপর এই নবদম্পতিকে রেখে তিনি (সা.) চলে আসেন। এর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) ফাতেমার ঘরে আসেন, তখন হযরত ফাতেমা (রা.) তাঁকে বলেন, হযরত হারেসা বিন নো'মান আনসারীর কয়েকটি ঘর আছে। আপনি তাকে যদি কোন একটি ঘর খালি করে দিতে বলেন তবে খুব ভাল হয়। মহানবী (সা.) বলেন, আমাদের জন্য ইতোমধ্যে তিনি কয়েকটি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। তাই এখন এটি বলতে আমার

লজ্জা হয়। হযরত হারেসা (রা.) কোনভাবে এটি শুনতে পেয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে ছুটে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যা কিছু আমার তা আপনারই। আল্লাহ্‌র কসম! আমার হাতে গচ্ছিত জিনিসের মাঝে সে জিনিস আমাকে বেশি আনন্দ দেয় যা অনুগ্রহপূর্বক আপনি গ্রহণ করেন। এরপর এই নিষ্ঠাবান সাহাবী অনেক পীড়াপীড়ি করে মহানবীকে মানিয়ে একটি ঘর খালি করিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন এবং হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.) সেখানে গিয়ে ওঠেন।

হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতেমা (রা.) নিজেদের দারিদ্র ও অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও জগৎবিমূখতা ও কৃচ্ছতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। এ সম্পর্কে হাদীসে, হযরত আলী (রা.) বলেন হযরত ফাতেমা (রা.) জাঁতা চালানোর ফলে হাতে কষ্ট হওয়ার অনুযোগ করেন। সেসময় মহানবী (সা.)-এর কিছু বন্দীও হস্তগত হয়, হযরত ফাতেমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলেন কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তিনি অর্থাৎ হযরত ফাতেমা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে আসার কারণ সম্পর্কে অবগত করেন। মহানবী (সা.) যখন ফিরে আসেন তখন হযরত আয়েশা হযরত ফাতেমার আসার কথা মহানবীকে অবগত করেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসেন ততক্ষণে আমরা আমাদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা দাঁড়াতে গেলে তিনি বলেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গাতেই থাক। এরপর তিনি আমাদের মাঝে বসে গেলেন এমনকি আমার বুকে তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি বলেন, তোমরা যা চেয়েছ আমি কি তোমাদের উভয়কে তার চেয়েও উত্তম কথা বলবো না? তা হলো, তোমরা উভয়ে যখন বিছানায় যাবে তখন ৩৪বার আল্লাহু আকবার, ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্‌ এবং ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ্‌ পড়ো, এটি তোমাদের উভয়ের জন্য কোন সেবকের চেয়েও অধিকতর উত্তম হবে।

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, হযরত ফাতেমা সেবক বা কাজের লোক চাওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং কাজ করতে কষ্ট হওয়ার কথা তুলে ধরেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা এভাবে কাজের লোক আমার কাছে পাবে না অর্থাৎ তিনি (সা.) দিতে চান নি যদিও গণিমতের মালে হযরত আলীরও অধিকার ছিল কিন্তু তিনি (সা.) দেন নি। তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলবো যা তোমার জন্য কাজের লোকের চেয়ে উত্তম হবে? তুমি বিছানায় যাবার পূর্বে ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্‌, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ্‌ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়ো, এটি সহীহ মুসলিমের হাদীস।

হযরত মুসলেহে মাওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিত বর্ণনা করতে গিয়ে এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন- প্রথমে বুখারীর বরাতে বর্ণনা করেন। হাদীসটি হলো, হযরত ফাতেমা (রা.) অনুযোগ করেন যে, জাঁতা চালাতে তার কষ্ট হয়, তখন মহানবী (সা.)-এর কিছু কৃতদাস হস্তগত হয়েছিল। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলেন কিন্তু তাঁকে না পেয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-কে তার আসার কারণ সম্পর্কে অবগত করে ঘরে ফিরে আসেন। মহানবী (সা.) ঘরে ফিরার পর যখন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে হযরত ফাতেমার আগমন সম্পর্কে অবগত করেন তখন মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসেন, আমরা ততক্ষণে আমাদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমি তাঁকে আসতে দেখে উঠতে চাইলাম কিন্তু মহানবী (সা.) বললেন, নিজ স্থানেই শুয়ে থাক। অতঃপর তিনি (সা.) আমাদের উভয়ের মাঝে বসে পড়েন এমনকি আমার বুকে তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করতে থাকি। তিনি বসে যাওয়ার পর বলেন, তোমরা যে জিনিস চেয়েছ আমি কি তোমাদেরকে তার চেয়েও উত্তম জিনিসের কথা বলবো না? আর তা হলো, তোমরা তোমাদের বিছানায় যাবার পর ৩৪বার আল্লাহু আকবার, ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্‌ এবং ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ্‌ পড়বে। এটি তোমাদের জন্য কাজের লোকের চেয়েও শ্রেয়তর হবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লেখেন, এই ঘটনা

থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.) ধন-সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে এতটাই সতর্ক ছিলেন যে, হযরত ফাতেমার একজন সেবকের প্রয়োজন ছিল এবং জাঁতাকল পিষার কারণে হাতে ব্যাথা হত কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে সেবক দেন নি বরং তিনি তাকে দোয়া করতে বলেছেন এবং আল্লাহ তা'লার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি (সা.) যদি চাইতেন তাহলে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে সেবক দিতে পারতেন কেননা, যে ধন-সম্পদ বণ্টনের জন্য এসেছে তা মহানবী (সা.)-এর কাছেই এসেছিল, আর এগুলো সাহাবীদের মাঝে বণ্টনের জন্য আসতো। এতে হযরত আলীরও অংশ থাকতে পারতো আর ফাতেমাও এর অধিকার রাখতেন। কিন্তু মহানবী (সা.) সাবধানতা অবলম্বন করেন এবং এসব সম্পদ হতে নিজ আত্মীয়-স্বজনদের দেয়া পছন্দ করেন নি। কেননা ভবিষ্যতে মানুষের এর ভুল ব্যাখ্যা করা ও বাদশাহ্‌র প্রজাদের সম্পদকে নিজের জন্য বৈধ জ্ঞান করার আশংকা ছিল। সুতরাং তিনি (সা.) সাবধানতাবশত হযরত ফাতেমাকে সেসব দাস-দাসী হতে, যারা তাঁর কাছে সে সময় বিতরণের জন্য এসেছিল, কোন দাসদাসী দেন নি। এখানে এটিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এসব সম্পদে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের অংশ নির্ধারণ করেছেন। তিনি (সা.) তা থেকে খরচ করতেন এবং তার আত্মীয়-স্বজনকেও প্রদান করতেন। তবে কোন জিনিস তাঁর ভাগে না আসা পর্যন্ত তিনি মোটেই তা থেকে খরচ করতেন না এবং একান্ত নিকটাত্মীয়দেরও দিতেন না। জগদ্বাসী কি এমন কোন বাদশাহ্‌র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে যে এভাবে বায়তুল মালের সুরক্ষা করেছে? যদি কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তবে তা কেবল এই পবিত্র সত্তার অনুসারীদের মাঝেই পাওয়া সম্ভব অন্য কোন ধর্ম এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে না।

হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক রাতে মহানবী (সা.) তার এবং নিজ কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর নিকট আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমরা দু'জন কি নামায পড় না? আমি উত্তরে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের প্রাণ আল্লাহ্ তা'লার হাতে। তিনি আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো পছন্দ হলে জাগিয়ে দেন। মহানবী (সা.) প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে ফিরে যান। এখানে নামায বলতে তাহাজ্জুদের নামায বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময় যদি আমাদের ঘুম না ভাঙে, তবে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আল্লাহ্ চাইলে আমাদের জাগিয়ে দেন আর তিনি জাগালে আমরা নামায আদায় করি। মহানবী (সা.) কোন কথা না বলে ফিরে যান। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমি শুনতে পাই, তিনি তাঁর উরুতে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলছিলেন যে, وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا অর্থাৎ মানুষ সবচেয়ে বড় তর্কবাগীশ।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এক রাতে তিনি (সা.) তার জামাতা হযরত আলী এবং কন্যা হযরত ফাতেমার ঘরে যান এবং বলেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ নামায পড়? অর্থাৎ সেই নামায যা মধ্যরাতের কাছাকাছি সময় উঠে পড়তে হয়? হযরত আলী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! (আমরা) পড়ার চেষ্টা করি, কিন্তু খোদা তা'লার ইচ্ছানুযায়ী কোন সময় আমাদের চোখ বন্ধ থাকলে তাহাজ্জুদ ছুটে যায়। তিনি (সা.) বলেন, তাহাজ্জুদ পড়বে এবং সেখান থেকে উঠে নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন আর যেতে যেতে বারবার বলছিলেন, وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا এটি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত যার অর্থ হলো, মানুষ অধিকাংশ সময় নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না এবং বিভিন্ন প্রকার যুক্তি দিয়ে নিজের দোষ গোপন করে। এ কথার অর্থ হলো, 'আমাদের কখনো কখনো ভুলও হয়ে যায়, হযরত আলী এবং হযরত ফাতেমা (রা.) এ কথা বলার পরিবর্তে তারা এটি কেন বললেন যে, খোদা তা'লা যদি চান যে আমরা জাগ্রত না হই, তখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি আর এভাবে নিজেদের ভুলকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কেন তারা আরোপ করলেন?

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটিকে আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, একবার যখন হযরত আলী মহানবীকে (সা.) এমন উত্তর দেন যাতে তর্ক-বিতর্কের দিকটি প্রকাশ পাচ্ছিল, তখন তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট হওয়া বা অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে এমন এক সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করেন যে, হযরত আলী হয়ত নিজ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এর স্বাদ উপভোগ করে থাকবেন। তিনি যে প্রশান্তি লাভ করে থাকবেন, তা তারই প্রাপ্য ছিল। আজও মহানবী (সা.)-এর এই অসন্তোষ প্রকাশের বিষয়টি অবগত হয়ে প্রত্যেক সূক্ষ্মদর্শী দৃষ্টি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়।

বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এক রাতে আমার ও ফাতেমাতুয্ যাহরার কাছে আসেন, যিনি তাঁর (সা.)-এর কন্যা ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ নামায পড় না? আমি উত্তরে বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহ্ তা'লার হাতে। যখন তিনি জাগাতে চান জাগিয়ে দেন। একথা শুনে তিনি (সা.) ফিরে যান এবং আমাকে কিছুই বলেন নি। তিনি পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অতঃপর আমি শুনতে পাই যে স্বীয় উরুতে হাত চাপড়ে তিনি বলছিলেন, মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিতর্ক করা আরম্ভ করে। সুবহানআল্লাহ্! কত চমৎকারভাবে তিনি হযরত আলীকে বুঝিয়েছেন যে, তার এরূপ উত্তর দেয়া উচিৎ হয় নি। অন্য কেউ হলে হয় তর্ক করা আরম্ভ করে দিত যে, আমার অবস্থান ও মর্যাদার প্রতি তাকাও আর এরপর তোমার উত্তরের প্রতি লক্ষ্য কর। এভাবে আমার কথা প্রত্যাখ্যান করার কোন অধিকার কি তোমার ছিল? এরূপ না হলেও কমপক্ষে এ বিতর্ক আরম্ভ করে বলতো, তোমার এই দাবি ভুল যে, মানুষ বাধ্য এবং তার সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তা'লার নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি যেভাবে চান সেভাবেই করান! তিনি চাইলে নামাযের সামর্থ দান করেন আর চাইলে দান করেন না। আরো বলতেন, বল প্রয়োগের শিক্ষা কুরআনের শিক্ষা বিরোধী। কিন্তু তিনি এ দু'টি পন্থার কোনটিই অবলম্বন করেন নি। তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি এবং বিতর্ক করে হযরত আলীকে তার কথার ভুলও ধরিয়ে দেন নি। বরং অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তার এ উত্তরে এভাবে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, মানুষ বড়ই অদ্ভুত! সকল বিষয়েই নিজের মতামতের পক্ষে কোন না কোন যুক্তি দাঁড় করায় এবং তর্ক আরম্ভ করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী (স.)-এর এতটুকু বলার মাঝে এমনসব কল্যাণ নিহিত ছিল যার একদশমাংশও অন্য কারো শত তর্কে বা বিতণ্ডায় লাভ হওয়া সম্ভব ছিল না।

এ হাদীস থেকে আমরা অনেকগুলো বিষয় জানতে পারি, যার কল্যাণে মহানবী (সা.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন আঙ্গিকের উপর আলোকপাত হয় এবং এখানে এর উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, প্রথমত এটি জানা যায় যে, ধর্মানুবর্তিতার প্রতি তিনি (সা.) কতটা যত্নবান ছিলেন। তিনি রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে তার নিকটজনদের ওপর দৃষ্টি রাখতেন। অনেক লোক আছে যারা নিজেরা পুণ্যবান হয়ে থাকে এবং মানুষকেও পুণ্যের শিক্ষা প্রদান করে, কিন্তু তাদের নিজ পরিবারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে থাকে। তাদের মাঝে নিজ পরিবারের সদস্যদেরও সংশোধন করার বৈশিষ্ট থাকে না। এমন লোকদের সম্পর্কেই এ প্রবাদ প্রসিদ্ধ যে, প্রদীপের নীচে অন্ধকার। অর্থাৎ যেভাবে প্রদীপ তার চারপাশের সব জিনিসকে আলোকিত করে, কিন্তু স্বয়ং তার নীচেই অন্ধকার থাকে, অনুরূপভাবে এরাও অন্যদের নসীহত করে বেড়ায় ঠিকই, কিন্তু নিজেদের ঘর বা পরিবারের প্রতি দৃষ্টি দেয় না যে, আমাদের আলো দ্বারা আমাদের নিজেদের ঘরের লোকেরা কতটা উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু বোঝা যায়, মহানবী (সা.)-এ বিষয়ের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন যে, তাঁর প্রিয়রাও যেন সেই আলোয় আলোকিত হয় যার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে আলোকিত করতে চাইতেন আর এ

বিষয়ে তিনি যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন। তিনি নিয়মিত তাদের পরীক্ষা করতেন ও ক্ষতিয়ে দেখতেন। প্রিয়জন বা পরিবারপরিজনের তরবিয়ত করা এমন একটি উন্নত পর্যায়ের গুণ, যা তাঁর মাঝে না থাকলে তাঁর চরিত্রে অতিমূল্যবান একটি জিনিসের ঘাটতি থেকে যেতো। দ্বিতীয়ত এটি জানা যায় যে, সেই শিক্ষার প্রতি তাঁর (সা.) পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যা তিনি পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করতেন। এক মিনিটের জন্যও তিনি এ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন না। মানুষ যেমনটি আপত্তি করে যে, নাঊযুবিল্লাহ্, জগদ্বাসীকে বোকা বানানোর জন্য এবং নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এসবের বন্দোবস্ত করেছিলেন, তাঁর কাছে কোন ওহী আসতো না! বিষয় এমন নয়, বরং নিজের রসূল এবং প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার বিষয়ে তাঁর এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কথার কথা বলা যায় যে হতে পারে, মানুষের কাছে কৃত্রিমভাবে নিজের সত্যতা প্রমাণ করতেন। কিন্তু এটা ভাবাও যায় না যে, রাতের বেলা এক ব্যক্তি বিশেষভাবে তার কন্যা ও জামাতার কাছে যাবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তারা সেই ইবাদত করে কিনা যা তিনি ফরয করেন নি, বরং তা আদায় করা মু'মিনদের নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন আর যা মাঝরাতে উঠে পড়া হয়। সেই সময় তাঁর যাওয়া এবং নিজ কন্যা ও জামাতাকে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে অনুপ্রাণিত করা সেই কামেল বা পরিপূর্ণ বিশ্বাসেরই প্রমাণ বহন করে যা সেই শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল, যার ওপর তিনি মানুষকে পরিচালিত করতে চাইতেন। অন্যথায় এক মিথ্যাবাদী ব্যক্তি, যে জানে যে, একটি শিক্ষার অনুসরণ করা বা না করা সমান, সে তার সন্তানসন্ততিকে এমন অসময়ে সেই শিক্ষা অনুসরণের উপদেশ দিতে পারে না। এটি তখনই হওয়া সম্ভব যখন এক ব্যক্তির হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, সেই শিক্ষার অনুসরণ করা ব্যতীত উৎকর্ষ অর্জিত হতে পারে না। তৃতীয় বিষয় সেটি যা প্রমাণের জন্য আমি এই ঘটনার উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ মহানবী (সা.) প্রতিটি বিষয় বুঝানোর জন্য ধৈর্যের পন্থা অবলম্বন করতেন এবং বাগবিতণ্ডার পরিবর্তে প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে কাউকে তার ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবগত করতেন। অতএব এখানে হযরত আলী (রা.) যখন তাঁর প্রশ্ন এভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন যে, আমরা ঘুমিয়ে গেলে আমাদের কী সাধ্য আছে যে, আমরা জাগ্রত হব, কেননা ঘুমন্ত মানুষ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে না, ঘুমিয়ে গেলে সে কীভাবে বুঝবে যে, এতটা বাজে আর এখন আমি অমুক অমুক কাজ করব। আল্লাহ্ তা'লা চোখ খুলে দিলে নামায পড়ে নেই, অন্যথায় অপারগতা হয়ে থাকে, কেননা তখন এলার্ম ঘড়ি ছিল না। একথা শুনে মহানবী (সা.)-এর বিস্মিত হওয়ারই ছিল, কেননা মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে যেরূপ ঈমান ছিল তা তাঁকে কখনোই এমন উদাসীন হতে দিত না যে, তাহাজ্জুদের সময় পার হয়ে যাবে আর তিনি জাগবেন না। তাই তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু এতটুকু বলেছেন যে, মানুষ কথা মান্য করে না, বরং বিতণ্ডা করে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তোমার চেষ্টা করা উচিত ছিল যেন সময় নষ্ট না হয়, এভাবে বিষয়টি টলানোর চেষ্টা করা উচিত হয় নি। অতএব হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আমি আর কোন দিন তাহাজ্জুদের নামায বাদ দেই নি।

এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে আর আগামীতেও চলবে ইনশাআল্লাহ্। বর্তমানে পাকিস্তানের পরিবেশ-পরিস্থিতি আরো বেশি কঠিন হয়ে উঠছে। সরকারের কিছু কর্মকর্তা মৌলভীদের অনুসরণ করে এবং তাদের সাথে গাঁটছড়া বেধে আমাদের যতটা ক্ষতি করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করছে। আপনারা বিশেষভাবে দোয়া করুন। রাবওয়ার আহমদী এবং পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে বসবাসকরী আহমদীদেরও আল্লাহ্ তা'লা সর্বত্র স্বীয় নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় দিন এবং শত্রুক্রুর অনিষ্ট থেকে তাদের নিরাপদ রাখুন আর তাদেরকে ভয়ানক ও ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন এবং অচিরেই এসব লোকের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন।

এরপর অর্থাৎ জুমুআর নামাযের পর আমি কয়েক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব, সংক্ষেপে তাদের কিছুটা স্মৃতিচারণ করছি। প্রথম স্মৃতিচারণ হবে জনাব কমাণ্ডার চৌধুরী মুহাম্মদ আসলাম সাহেবের, যিনি কানাডায় বসবাস করছিলেন আর গত ২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। কমাণ্ডার সাহেব ১৯২৯ সনে গুজরানওয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গুজরানওয়ালা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তালীমুল ইসলাম কলেজ এবং এফ সি সরকারী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন আর লাহোর সরকারী কলেজ থেকে বি এস সি করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর আব্দুস সালাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে তিনি পদার্থ বিদ্যায় এম এস সি করার সুযোগ লাভ করেন। এরপর ১৯৪৮ সনে তিনি ফুরকান বাহিনীতে যোগ দিয়ে আযাদ কাশ্মীরে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, যেখানে তাকে 'মুজাহেদ-এ-কাশ্মীর' সনদ এবং 'আযাদী-এ-কাশ্মীর' পদকে ভূষিত করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে মরহুম পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন, যেখানে তিনি পাকিস্তানের নেভাল একাডেমীতে ডাইরেক্টর অফ স্টাডিয, কোহাট-এ ডেপুটি প্রেসিডেন্ট অফ ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড, নেভাল হেড কোয়ার্টার ইসলামাবাদ-এ ডেপুটি ডাইরেক্টর, নেভাল এডুকেশনাল সার্ভিসেস সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। মরহুম শিক্ষা বিভাগে নেভির নতুন স্কুল এবং কলেজ চালু করার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নেভাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালনেরও তৌফিক লাভ করেছেন। পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে অবসরের পর তিনি কানাডা চলে যান এবং টরেন্টোর মিশন হাউজে এক বছর ওয়াকফে আরযী করেন। এরপর ১৯৯৩ সালে অবসরোত্তর ওয়াক্ফ করার আবেদন করলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তা গ্রহণ করেন। তার জামাতের সেবা সুদীর্ঘ ২৮ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে মরহুম সেক্রেটারী জায়েদাদ, সেক্রেটারী রিশতানাতা, এডিশনাল সেক্রেটারী মিশন হাউজ এবং হোমিওপ্যাথি ক্লিনিকে সহকারী হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। মরহুম অত্যন্ত নম্রভাষী, বিনয়ী সবার প্রতি স্নেহশীল নামাযের প্রতি নিষ্ঠাবান, খিলাফতের সাথে আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন। জীবন উৎসর্গ করার পর তিনি প্রতিটি মুহূর্ত জামা'তের সেবায় নিয়োজিত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। বিগত কিছুকাল যাবৎ বেশ অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যখনই সুস্থতা অনুভব করতেন তখনই মিশন হাউজে চলে আসতেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধর্মের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তার পেছনে স্ত্রী এবং তিন পুত্র রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার পুণ্যসমূহ তার সন্তানসন্ততির মাঝেও চলমান রাখুন। তার পুত্রবধু নুসরত জাহাঁ বলেন, মরহুম অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়ার্দ্র এবং পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াক্ফের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একজন আদর্শ স্বামী ও পিতা ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার সন্তানদেরকে উপদেশ দিতে থাকেন যে, জামা'ত ও খোদার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা আর নিয়মিত নামায পড়া একান্ত জরুরী। তিনি নিজেও সারা জীবন তাহাজ্জুদ এবং (অন্যান্য) নামায নিয়মিত আদয় করেছেন।

দ্বিতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া শাহিনা ক্বমর সাহেবার। তিনি নাযারাত উলীয়ার ড্রাইভার ক্বমর আহমদ শফিক সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। শাহিনা ক্বমর সাহেবা এবং তার ছেলে স্নেহের সামার আহমদ ক্বমর গত ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে দুপুর সোয়া একটার সময় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স ছিল ৩৮ বছর আর স্নেহের সামার আহমদ ক্বমরের বয়স ছিল ১৭ বছর। শাহিনা ক্বমর সাহেবা শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্বামী এবং ২ মেয়ে, ১ ছেলে ছাড়াও ৩ ভাই রেখে গেছেন। শাহিনা ক্বমর সাহেবার মেয়ে বলেন, আমার মা অনেক পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। আমাকে সর্বদা পুণ্যকর্মের উপদেশ দিতেন। তিনি নিজেও সর্বদা পুণ্যকর্ম সম্পাদনে সবার অগ্রে থাকতেন। সকল বিষয়

আমার সাথে শেয়ার করতেন। আমার অনেক ভালো বান্ধবীও ছিলেন। । আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এটি লিখেছেন যে, মাশাআল্লাহ্, জামা'তের কাজের প্রতি তিনি অনেক আকর্ষণ রাখতেন এবং কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তার স্বামীও লিখেছেন যে, স্বল্প শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অতি উত্তমরূপে ঘর পরিচালনাকরেছেন এবং সন্তানদেরও উত্তম তরবিয়ত করেছেন। এরপর ক্বমর আহমদ শফিক সাহেবের পুত্র স্নেহের সামার আহমদ ক্বমর সাহেবের স্মৃতিচারণ করছি। সেও সড়ক দুর্ঘটনায় তার মায়ের সাথেই মৃত্যুবরণ করে। তালিমুল ইসলাম কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পড়াশোনায় ভালো ছিল। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে খোদ্দামদের সাথে দায়িত্ব পালন করত। জামা'তী কাজে খুবই সক্রিয় ছিল। যখনই যয়ীমের পক্ষ থেকে আহ্বান করা হতো তখনই সে, সব কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। তার পিতা লিখেন, কখনো কখনো ৩-৪ দিনের জন্য আমি সফরে চলে যেতাম; তখন সে বলত, আব্বু আপনি চিন্তা করবেন না আমি বাড়ির দেখাশুনা করবো। আপনি নিশ্চিন্তে আপনার দায়িত্ব পালন করুন; বাস্তবে সে এমনই ছিল। অত্যন্ত দায়িত্ববান ছেলে ছিল। সামার আহমদ ক্বমর-এর বড় বোন সামরিন বলেন, মাশাআল্লাহ্ আমার ভাই খুবই ভালো ছিল, সে কখনো রাগ করত না আর আমি কখনো তাকে বকাঝকা করলেও সে রাগান্বিত হতো না এবং অসন্তুষ্টও হতো না, বরং শিশুদের সাথেও ভাইবোনদের সাথে খুবই আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। বাকি ছোট ভাইবোনেরাও এমনটাই লিখেছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং পুরো পরিবার, ছোট ছেলেমেয়েদের এবং তাদের পিতাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

পরবর্তী জানাযা শ্রদ্ধেয়া সাঈদা আফযাল খোখার সাহেবার। তিনি শহীদ মুহাম্মদ আফযাল খোখার সাহেবের স্ত্রী এবং শহীদ আশরাফ মাহমুদ খোখার সাহেবের মাতা। তার স্বামীও শহীদ হয়েছিলেন এবং পুত্রও শহীদ হন। তিনি ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কানাডাতে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। স্বামী এবং পুত্রের শাহাদাতের পর তাঁকে একান্ত কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য এবং সাহসিকতার সাথে সকল কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে জীবন কাটিয়েছেন। কখনো কোন অভিযোগ মুখে আনতেন না। তিন মেয়ের বিয়ে দেয়ার মত গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর আরেকজন যুবক ছেলে আসিফ মাহমুদ খোখারের আকস্মিক বিয়োগবেদনাও তাকে সইতে হয়। তখনও তিনি পরম সহনশীলতা প্রদর্শন করেন এবং ধৈর্যশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নিজের সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। অতিথিপরায়ণ ও গরিব-দুঃখীদের লালনকারীনি ছিলেন। খিলাফতের সাথে ভক্তি, সম্মান এবং ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। জামা'তের বিভিন্ন তাহ্রীকে উৎসাহউদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। জীবনভর তার পিতামাতা, শহীদ স্বামী, নিজ পুত্র এবং পরিবারের অন্যান্য বুযূর্গের নামে দানখয়রাত করেছেন। তার পিতা জনাব মির্যা ফযল করীম সাহেব এবং মাতা সুগরা বেগম সাহেবা ছিলেন ইসলাম এবং আহমদীয়াতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পূর্ব লণ্ডনের মোহতরম মির্যা মুজীব আহমদ সাহেব এবং মির্যা ফজলুর রহমান সাহেবের সবচেয়ে বড় বোন ছিলেন। তিনি লাহোরের মুবারক খোখার সাহেবের বড় ভাবি এবং মুবারক সিদ্দিকী সাহেবের বড় খালা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুমা ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তিনি তার পশ্চাতে এক পুত্র জনাব বেলাল আহমদ খোখার সাহেব এবং তিন কন্যা তৈয়্যবা কুরায়শী, তাহেরা মাজেদ এবং সামীনা খোখার-কে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন আর সন্তানদেরও তাদের মায়ের পুণ্যকর্ম সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)